সবচেয়ে ভয়ংকর বিদআত
(এবং শামের জিহাদে এর প্রভাব)

দাবিক ৮ হতে সংকলিত

সবচেয়ে ভয়ংকর বিদআত (এবং শামের জিহাদে এর প্রভাব)

সালাফদের আলেমগণ ইরজার বিদআতের ব্যাপারে চরমভাবে সতর্ক করেছেন, যেহেতু এটা একটা ভয়ংকর বিদআত, যা মুসলিমদের দ্বীনকে হালকা করে দিয়েছিল এভাবে যে, বড় বড় গুণাহসমূহ এবং এমনকি কুফরও নগণ্য মনে করা হত। ইরজার মাধ্যমে মুসলিম সাধারণ জনগণ তাদের ধর্ম চর্চা ছেড়ে দিতে লাগল এবং তাদের ঈমানী কাজগুলোকে দুনিয়াবী ব্যবসা এবং –আরও খারাপ ভাবে- বিদআতী কাজ দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে লাগল। এমনকি তারা দ্বীন শিক্ষা থেকে ঘুরে গেল, যেন দ্বীনী বিষয়ে সামান্য ধারণা তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল এবং দুনিয়াবী শিক্ষার উপরে জোর দিল। ধীরে ধীরে অজ্ঞতা এমন পর্যায়ে গেল যেভাবে আল-ফুদাইল ইবনে লাইয়াদ (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন-মৃত্যু ১৮৭ হিজরী) বর্ননা করেছেন, “তোমার অবস্থা কেমন হবে যদি তুমি ঐ সময়ে পৌঁছাও এবং যখন দেখবে যে মানুষ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে না অথবা মুমিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য করে না অথবা বিশ্বাসী ও বিশ্বাসঘাতকের মধ্যে পার্থক্য করে না অথবা মূর্খ ও জ্ঞানীর মধ্যে পার্থক্য করে না। তারা ভালোকে ভালো বা খারাপকে খারাপ বলে জানবে না” [আল-ইবানাহ আল-কুবরা]।

ইবনে বাত্তাহ (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন-মৃত্যু ৩৮৭ হিজরী) আল ফুদাইলের কথায় এ বলে মন্তব্য করেন যে, “নিশ্চয় আমরা আল্লাহর এবং আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করব। আমরা সেই যুগে পৌঁছে গেছি, শুনেছি, তার বেশির ভাগই জেনেছি এবং স্বচক্ষে দেখেছি। যদি একজন মানুষ, যাকে আল্লাহ যথেষ্ট জ্ঞান এবং গভীর সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়েছেন, ইসলাম ও এর মানুষের অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করে, পর্যবেক্ষণ করে এবং গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে –সবচেয়ে ধোঁকার পথ এবং সবচেয়ে সরল পথ অনুসরণের মাধ্যমে- তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, অধিকাংশ এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মানুষ তাদের পিঠ ঘুরিয়ে নিয়েছে। তারা তাদের উদ্দেশ্য থেকে সরে গেছে এবং সঠিক প্রমাণ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। অনেক মানুষের পরিসমাপ্তি এভাবে ঘটেছে যে, তারা তা উত্তম মনে করে যা পূর্বে অপবিত্র মনে করত, আর তা হালাল মনে করে যা পূর্বে হারাম মনে করত এবং তা ভালো মনে করে যা পূর্বে খারাপ মনে করত। এ ধারণা –আল্লাহ তোমাকে রহম করুন- মুসলিমদের চরিত্র থেকে বা এই দ্বীন সম্পর্কে সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্নদের কাজ থেকে বা যারা নিশ্চিত ভাবে এই দ্বীনে বিশ্বাস করত তাদের আমল থেকে আসে নি' [আল-ইবানাহ আল-কুবরা]।

ইবনে বাত্তাহ আরও বলেছেন, “আমাদের যুগের মানুষেরা পাখির ঝাঁকের মত। তারা একে অপরকে অনুসরণ করে। যদি কোন মানুষ এসে নবুওয়াত দাবী করত -যদিও সে জানত যে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শেষ নবী- অথবা দাবী করত যে সে রব, সে তার আহবানে অনুসরণকারী এবং সাহায্যকারী খুজে পেত” [আল-ইবানাহ আল-কুবরা]।

কারণ উম্মাহর ক্ষেত্রে যা ঘটে গেছে তা এই বিপদজনক বিদআতের জন্য,এ ব্যাপারে সকল মুয়াহহিদ মুজাহিদের জন্য সূক্ষ্মদৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে যখন এটা জিহাদের সাথে সম্পর্কিত থাকে।

“আমাদের যুগের মানুষেরা পাখির ঝাঁকের মত”- ইবন বাত্তাহ

সালাফগণ এবং ইরজার বিরুদ্ধে তাদের কড়া সতর্কবার্তা

যে সালাফগণ ইরজার উত্থান দেখেছেন তারা অনেক আগেই এর বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা দিয়েছেন। তারা জানতেন যে এটা দ্বীনের 'ইলম ও আমল' উভয়ের ক্ষেত্রে এগুলোর বর্জনের দিকে নিয়ে যাবে।

সাইদ ইবনে জুবায়ের (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন-মৃত্যু ৯৫ হিজরী) বলেন, "মুরজিয়ারা হল কিবলার ইহুদী"।[১] [আস-সুন্নাহ – আব্দুল্লাহ ইবনে আল-ইমাম আহমাদ]

ইবরাহীম আন-নাখাই (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন-মৃত্যু ৯৬ হিজরী) বলেন, "আমি এ উম্মতের জন্য আজারিকাহ (খারেজীদের একটি দল) এর ফিতনা থেকে মুরজিয়াদের ফিতনাকে বেশি ভয় করি"। [আস-সুন্নাহ – আব্দুল্লাহ ইবনে আল-ইমাম আহমাদ]

তিনি আরও বলেন, " আমি মুসলিমদের জন্য আযারিকাহ এর সংখ্যা থেকে মুরজিয়াদের বেশি ভয় করি। [আস-সুন্নাহ – আব্দুল্লাহ ইবনে আল-ইমাম আহমাদ]

তিনি আরও বলেন, "আমার মতে মুরজিয়াদের থেকে খারেজীরা বেশি ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য"। [আস-সুন্নাহ – আব্দুল্লাহ ইবনে আল-ইমাম আহমাদ]

তিনি আরও বলেন, "মুরজিয়ারা ইসলামকে খুবই পাতলা কাপড়ের চেয়েও হালকা ভাবে নিয়ে ইসলাম ত্যাগ করেছে"। [আস-সুন্নাহ – আব্দুল্লাহ ইবনে আল-ইমাম আহমাদ]

তিনি আরও বলেন, "মুরজিয়ারা একটা মতাদর্শ আবিষ্কার করেছে, তাদেরকে আমি উম্মাতের জন্য ভয় করি। তাদের অনিষ্ট অত্যন্ত বড়, তাই তোমরা তাদের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাক"। [আশ-শারীয়াহ আল-আজুরি]।

তিনি আরও বলেন, "মতাদর্শের ক্ষেত্রে মুরজিয়াদের চেয়ে বোকা আর কাউকে আমি জানি না"। [আস-সুন্নাহ – আব্দুল্লাহ ইবনে আল-ইমাম আহমাদ]

মুজাহিদ (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন-মৃত্যু ১০৪ হিজরী) বলেন, "তারা মুরজিয়া হয়ে শুরু করে, তারপর কাদারিয়া হয় (যারা তাকদির কে অস্বীকার করে), তারপর মাজুসীতে (অগ্নিউপাসক) পরিণত হয়"। [আল-লালিকাই]

কাতাদাহ (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন-মৃত্যু ১১৮ হিজরী) এবং ইয়াহিয়া ইবনে আবি কাছির (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন-মৃত্যু ১২৯ হিজরী) বলেন, "মুরজিয়াদের থেকে বেশি বিপদজনক, যাকে আমরা ভয় করি, আর কিছু নাই। [আস-সুন্নাহ – আব্দুল্লাহ ইবনে আল-ইমাম আহমাদ]

মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনে আল-হুসাইন (আল্লাহ তাঁদেরকে রহম করুন-মৃত্যু ১১৮ হিজরী) বলেন, "দিনে ও রাতে মুরজিয়াদের থেকে বেশি ইহুদীদের অনুরূপ আর কেউ নাই। [আল-লালিকাই]

আয-যুহুর (আল্লাহ তাঁদেরকে রহম করুন-মৃত্যু ১২৪ হিজরী) বলেন, "ইসলাম আগমনের পরে এর মানুষের জন্য ইরজার থেকে বেশি ভয়ংকর কিছু আর আবিষ্কৃত হয়নি"। [আশ-শারীয়াহ আল-আযুরি]

---

১ মুরজিয়ারা একটি ধর্মের আবিষ্কার করল যাদের অনুসারীরা জান্নাতে প্রবেশ করার আশা করে, যদিও তারা ঈমানের মৌলিক আমলসমূহকে সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করে (ইসলামের যে চারটি খুঁটি রয়েছে কালিমায়ে শাহাদতের পরে) এবং এর কথাগুলোর যুক্তিযুক্ত সমর্থন দাবী করত। অতএব, তাদের অবস্থা ঐ নির্বোধ ইহুদীদের মত যারা {কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করে আর কিছু অংশে অবিশ্বাস করে} [আল-বাকারাহঃ৮৫] এবং বলে, {আমরা শুনলাম কিন্তু মানলাম না}[আল-বাকারাহঃ৯৩] কিন্তু তথাপি তারা বলে, {আমাদেরকে আগুন খুব অল্প দিনের জন্য স্পর্শ করবে} [আল-বাকারাহঃ৮০] এবং {আমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে}[আল-আ'রাফঃ১৬৯]। সালাফগণ ইরজাকে খ্রিষ্টান ধর্মের সাথেও তুলনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, " ইরজা থেকে সাবধান থাক, কারণ এদের দৃষ্টিভঙ্গি খ্রিস্টানদের মত" [আল লালিকাই]। খ্রিস্টানরা ইহুদীদের মত বলে যে, মুক্তির জন্য শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট, এর সাথে আমলের কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের কথার জবাব এভাবে দিয়েছেন, {বলুন, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোন অঙ্গীকার পেয়েছ যে, আল্লাহ কখনও তার খেলাফ করবেন না -না তোমরা যা জান না, তা আল্লাহর সাথে জুড়ে দিচ্ছ। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং সে পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে, তারাই দোযখের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে}" [আল বাকারাহ ৮০-৮২]। আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের সহ খ্রিস্টানদের কথার জবাব এভাবে দিয়েছেন, {ওরা বলে, ইহুদী অথবা খ্রিষ্টান ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না। এটা ওদের মনের বাসনা। বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত কর। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পন করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না} [আল বাকারাহ ১১১-১১২]। আরও দেখুন, সুরা নিসার আয়াত নং (১২৩-১২৪)। ইহুদী এবং খ্রিষ্টান তারা উভয়েই বলে যে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য তাদের নবীদেরকে মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াই যথেষ্ট, যদিও তারা এই বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় তাৎপর্য বর্জন করেছিল যা ছিল সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কথা ও কাজের মাধ্যমে অনুসরণ করা, যেহেতু তাঁর সম্পর্কে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে ভবিষ্যৎবাণী করা ছিল। পরিশেষে বলা যায়, পাপ ও অন্যায় করার জন্য আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার অজুহাত দেখানোই ঠিক নয়, শিরক ও কুফর তো অনেক দূরের বিষয়!

মানসুর ইবনে আল-মুতামির (আল্লাহ তাঁদেরকে রহম করুন-মৃত্যু ১৩৩ হিজরী) বলেন, "মুরজিয়াহ এবং রাফিদারা আল্লাহর শত্রু"। [আল-লালিকাই]

মুগিরাহ আদ-দাব্বিহ (আল্লাহ তাঁদেরকে রহম করুন-মৃত্যু ১৩৩ হিজরী) বলেন, "আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই,আমি দ্বীনের জন্য ফুসাকদের (পাপী) থেকেও মুরজিয়াদের বেশি ভয় করি"। [আস-সুন্নাহ – আব্দুল্লাহ ইবনে আল-ইমাম আহমাদ]

আল-আমাশ (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন-মৃত্যু ১৪৮ হিজরী) বলেন, "আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই,আমি মুরজিয়াদের থেকে বেশি অশুভ আর কাউকে দেখিনি"। [আস-সুন্নাহ – আব্দুল্লাহ ইবনে আল-ইমাম আহমাদ]

সুফিয়ান আছ-ছাওরি (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন-মৃত্যু ১৬১ হিজরী) বলেন, "ইরজার ধর্ম একটি আবিষ্কৃত ধর্ম"। [আস-সুন্নাহ - আল-খাল্লাল]

তিনি কুরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে আরও বলেন, "মুরজিয়াদের চেয়ে এর (কুরআন) থেকে দূরবর্তী আর কেউ নাই"। [আল-লালিকাই]

শারিক (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন-মৃত্যু ১৭৭ হিজরী) বলেন, "মুরজিয়ারা সবচেয়ে বেশি কলুষিত। রাফিদারা মোটামুটি কলুষিত ছিল কিন্তু মুরজিয়ারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে"। [আস-সুন্নাহ – আব্দুল্লাহ ইবনে আল-ইমাম আহমাদ]

ইবনুল-মুবারক (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন-মৃত্যু ১৮১ হিজরী) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "কার উত্থান আগে হবে, দাজ্জাল না পশু? তিনি উত্তর দিলেন, "দাজ্জাল অথবা পশুর উত্থানের থেকেও জাহমিয়াদেরকে বুখারার বিচারক নিয়োগ দেওয়া বেশি বিপদজনক"। তখন বিচারক ছিল চরমপন্থী মুরজিয়া। [আস-সুন্নাহ – আব্দুল্লাহ ইবনে আল-ইমাম আহমাদ]

আন-নাদর ইবনে শুমাইলকে (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন-মৃত্যু ২০৪ হিজরী) ইরজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তাই তিনি জবাবে বলেন, "এটি একটি ধর্ম যা রাজা বাদশাদের প্রবৃত্তির সাথে মিলে যায়, যার মাধ্যমে মুরজিয়ারা রাজাদের দুনিয়া লাভ করে এবং তাদের ধর্মের কিছু অংশ হারায়"। [আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া] [২]

যদি সালাফগণ ইরজার বিরুদ্ধে এত হুঁশিয়ারি দিয়ে থাকেন, তাহলে মুসলিমরা কীভাবে এই নতুন আবিষ্কারকে একেবারে উপেক্ষা করতে পারে?

ইরজা এর উৎপত্তি এবং অর্থ

ইরজা ছিল খারেজীদের বক্রতার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া। মুরজিয়ারা খারেজীদের থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে ছিল সুন্নাহকে আকঁড়ে না ধরে, এটা করার ফলে, তারা তাদের নিজেদের দল তৈরি করল। এর সবচেয়ে ভাল

২ অতীতের মুরজিয়ারা -দ্বীনকে হালকা ও গুনাহের ভয়াবহতাকে তুচ্ছ মনে করার কারণে- মুসলিম শাসকদের আরও বেশি পাপ ও অন্যায় করার সুযোগ দিত। তৎকালীন কিছু মুরজিয়ারা তাদের সমসাময়িক তাগুতদের মানবরচিত আইন প্রণয়নে ও ইহুদী, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক, মুরতাদদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহায়তা দিতে সমর্থন করত।

ব্যাখ্যা দিয়েছেন সালাফগনের আলেম, সাইদ ইবনে জুবায়ের (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন), যিনি বলেন, “মুরজিয়াদের ধর্ম হল সাবিয়ানদের মত। তারা ইহুদীদের কাছে গেল এবং জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমাদের দ্বীন কী?’ তারা বলল, ‘ইহুদীবাদ’। তারা জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমাদের কিতাব কী?’ তারা বলল, ‘তাওরাহ’। তারা জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমাদের নবী কে?’ তারা বলল, ‘মুসা’। তারা জিজ্ঞাসা করল, ‘যারা তোমাদের অনুসরণ করে তাদের জন্য কি আছে?’ তারা বলল, ‘জান্নাহ’। তখন তারা খ্রিস্টানদের কাছে গেল এবং জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমাদের দ্বীন কী’? তারা বলল, ‘খ্রিস্টধর্ম’। তারা জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমাদের কিতাব কী’? তারা বলল, ‘ঈঞ্জিল’। তারা জিজ্ঞাসা করল, “তোমাদের নবী কে’? তারা বলল, ‘ঈসা’। তারা জিজ্ঞাসা করল, ‘যারা তোমাদের অনুসরণ করে তাদের জন্য কি আছে’? তারা বলল, ‘জান্নাহ’। তখন তারা ঘোষণা দিল, “আমরা এই দুই ধর্মের মধ্যবর্তী”। [আল-লালিকাই]

মুরজিয়ারা খারেজীদের প্রতিরোধ (বিরোধিতা) করে যারা সকল ফরজ আমলকে এবং সকল পাপের বর্জনকে জরুরী বানিয়েছে মুসলিম হওয়ার জন্য, তারা তাদের নিজস্ব উদ্ভাবনের মাধ্যমে জবাব দেয়, দাবী করে যে সকল ফরজ কাজের আমল এবং সকল পাপের বর্জন একজনের ঈমানকে প্রভাবিত করে না, এমনকি যদি কেউ ইসলামের ভিত্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে ছেড়ে দেয়! তারা ঈমানের বাস্তবতা থেকে আমলকে বাদ দেয় ঈমানের সংজ্ঞা থেকে আমলকে ‘বিলম্ব’ করানোর মাধ্যমে এবং এটা ইরজা শব্দের আভিধানিক মূল, কেননা ইরজা মানে “একটি বিলম্ব”।

তাদের আবিষ্কারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, অভিব্যক্তি এবং ব্যবহারিক ফলাফল আছে - যার মধ্যে কিছু আলোচনা করা হবে- কিন্তু এটা প্রথমে স্মরণ করা প্রয়োজন যে ঈমানের সংজ্ঞার ব্যাপারে উলামাদের বাহ্যিক ঐক্যমত এবং দু'য়াত এটা মনে করে না যে তারা তাদেরকে ইরজা থেকে মুক্ত করেছেন। এটা সম্পূর্ণ পরিস্কার হয়ে যায় যখন কেউ সমসাময়িক সালাফী দরবারী আলেমদের বিবৃতি গবেষণা করে, যারা বলে যে মানবসৃষ্ট আইনে শাসন করা এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদের পক্ষ নেওয়া বড় কুফরী কিন্তু সৌদি সরকারের উপর এই তাত্বিক বিধান বাস্তবায়ন করে না। বরং তারা সালাফগণ ও উলামাদের বিবৃতিকে প্যাঁচায়, যাতে একটা অব্যাহতি এবং তাদের প্রভুদের কুফরীর সমর্থন আবিষ্কার করা যায়। অনুরুপভাবে, এ যুগে অনেকেই ছিলেন যারা হাদীসশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ এবং নিয়মিত ভাবে সালাফগণের দেওয়া ঈমানের সংজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্তি করেন,“ঈমান হল কথা ও কর্ম; এটা কমে ও বাড়ে”। তারপরেও তারা পরিষ্কার ভাবে এ সংজ্ঞার বিরোধিতা করে এ বলে যে, যদি কোন মুসলিম সম্পূর্ণ ভাবে একসাথে সালাত, যাকাত, সিয়াম এবং হজ ছেড়ে দেয় এবং আল্লাহকে বিদ্রুপ করে তারপরেও সে মুসলিম থাকতে পারে এবং অবশেষে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এভাবে তারা ইসলামকে একটি অবাস্তব দাবীতে পরিণত করেছে।

> তখন তারা ঘোষণা দিল, “আমরা এই দুই ধর্মের মধ্যবর্তী”

আল সালুলের দরবারী আলেম

সালাফগণের দেওয়া ইরজার সংজ্ঞা

প্রকৃত মুরজিয়ারা ঈমানের সংজ্ঞা থেকে আমলকে বাদ দিয়েছে, শুধু অন্তর ও জিহবার স্বীকারোক্তিকে আবশ্যক করেছে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, এই সাক্ষ্যদানের মৌখিক স্বীকারোক্তি। তারা আরও দাবী করে যে ঈমান বাড়ে না বা কমে না। তাদের এ ঈমানের বুঝে অনেক ইঙ্গিত, ফলাফল এবং রুপান্তর রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হল যে, ফরয কাজ গুলো সম্পূর্ণ বর্জন করলে কারও ঈমান আক্রান্ত হয় না, মুনাফিকি বলে কোন কিছু থাকে না এবং আবশ্যক ভাবে প্রত্যেক মুসলিমের জানা আছে এমন বিখ্যাত ও সুপরিচিত ঘটনার উপেক্ষা করা তুচ্ছ হয়ে যায়।

মুরজিয়াদের মতে আত্মসমর্পণ তুচ্ছ

মুরজিয়ারা আহলুস সুন্নাহর বিরোধিতা করে এ বলে যে, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা জরুরী না।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন – মৃত্যু ১৯৯ হিজরী) কে ইরজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তাই তিনি জবাবে বলেন, "মুরজিয়া বলে যে ঈমান হল স্বীকারোক্তি। আমরা বলি ঈমান হল স্বীকারোক্তি ও কর্ম। মুরজিয়ারা তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেয় যে, স্বীকার করে যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই যদিও সে অন্তরে ফরয কাজগুলোকে বর্জন করতে মনস্থ করে। [৩] তারা ফরয কাজ বর্জন করাকে অন্য সব পাপের মত সাধারণ পাপ মনে করে, যদিও এগুলো এক নয়, যেমন ইস্তিহলাল ছাড়া গুনাহ (গুনাহকে হালাল মনে করা) হল সাধারণ পাপ আর মূর্খতা বা অজুহাত ছাড়া সচেতন ভাবে পাপ করা কুফরী। আদম (আলাইহি সালাম), ইবলিস (আল্লাহ তাকে অভিশাপ করুন) ও ইহুদী রাব্বীদের ঘটনা যা পরিষ্কার করে দেয়। আদমের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁকে ঐ গাছ থেকে ফল খাওয়া নিষেধ করেন এবং এটা তার জন্য হারাম করে দেন, তারপরেও তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে তা থেকে খান, যাতে তিনি (আদম) ফেরেশতা বা অমর হয়ে যান, তাই তাঁকে কুফর ব্যতীত অবাধ্য বলা হয়। ইবলিসের (আল্লাহ তাকে অভিশাপ দিন) ক্ষেত্রে, আল্লাহ তাকে শুধু একটা সিজদা ফরয করলেন, কিন্তু সে ইচ্ছা করে প্রত্যাখ্যান করল, এজন্য তাকে কাফির বলা হয়। ইহুদী রাব্বীদের ক্ষেত্রে, তারা নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ননা জানত এবং জানত যে তিনি নবী ও রাসূল-যেভাবে তারা তাদের নিজের সন্তানকে জানত- এবং মৌখিক ভাবে স্বীকার করত কিন্তু তাঁর শারীয়াহ তারা অনুসরণ করেনি, তাই আল্লাহ তাদেরকে কাফির বলেছেন। তাই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা আদম (আলাইহি সালাম) ও অন্যান্য নবীদের পাপের মত। প্রত্যাখ্যানের সাথে ফরজকে বর্জন করলে তা কুফরী হবে যেমন ইবলিসের কুফরী। আর সচেতন ভাবে কিন্তু অস্বীকার না করে করলে তখন তা ইহুদী রাব্বীদের কুফরীর মত কুফরী হবে। এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। [আস-সুন্নাহ – আব্দুল্লাহ ইবনে আল-ইমাম আহমাদ]

আল-হুমায়দি (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন – মৃত্যু ২১৯ হিজরী) বলেন, "আমাকে ঐ মানুষদের সম্পর্কে বলা হয় যারা বলে, 'যে কেউ সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ্জ কে স্বীকার করে, কিন্তু এর মধ্যে কোন একটা মৃত্যু অবধি পালন করে না এবং তার পিঠ কিবলার দিকে করে মৃত্যু পর্যন্ত সালাত আদায় করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুমিন থাকবে যতক্ষণ সে ফরয কাজগুলো অস্বীকার না করে, যদি সে জানে যে এই ফরয গুলোকে অস্বীকার না করা তার ঈমানকে নিশ্চিত করে এবং সে ফরযগুলোকে এবং কিবলার দিক মেনে নেয়'। আমি বলি এটা প্রকাশ্য কুফরী এবং এটা আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ এবং মুসলিম উলামাদের বিপক্ষে। আল্লাহ (তায়ালা) বলেন, "{তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে । এটাই সঠিক ধর্ম।}" [আল-বাইয়িনাহঃ৫] [আল-লালিকাই]।

ইমাম আহমাদ আরও বলেন, "যে কেউ তদ্রুপ বলে, সে আল্লাহকে অস্বীকার করল, আল্লাহর আদেশ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন তা প্রত্যাখ্যান করল"। [আল-লালিকাই]

ইসহাক ইবনে রাহাবেহ (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন – মৃত্যু ২৩৮ হিজরী) বলেন, "মুরজিয়ারা ঐসব ক্ষেত্রে চরমপন্থায় পড়ে যায় যখন তাদের কেউ বলে, 'যে কেউ ফরয সালাত, রমজানের সিয়াম, যাকাত, হজ্জ এবং সাধারণ ফরয কাজগুলির ফরযিয়াত অস্বীকার না করে বর্জন করে, তখন আমরা তাকে তাকফির করি না এবং তার বিষয়টা পরকালে আল্লাহর সাথে জড়িত, কেননা সে ফরজকে স্বীকৃতি দেয়'। এরাই হল মুরজিয়াহ যাদের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। [মাসাইল আল ইমাম আহমাহ ওয়া ইসহাক ইবনে রাহাবেহ]

সালাফগণ প্রমাণ হিসেবে আরও পেশ করেন, "{অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও,

জারাবলুস শহরে দিওয়ান আয-যাকাত

৩ ফরজগুলো বলতে তিনি ঈমানের সাক্ষ্য দেওয়ার পর ইসলামের ৪টি স্তম্ভকে (সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ) বুঝিয়েছেন যা পরবর্তী উদ্ধৃতিগুলোতে আরও স্পষ্ট হবে। সাহাবারা স্পষ্টভাবে একমত ছিলেন যে, সালাত পরিত্যাগ করা বড় কুফর। একজন ব্যাক্তির অন্যান্য ৩টি স্তম্ভের যেকোনো একটি পরিত্যাগের ক্ষেত্রে কি হুকুম এ ব্যাপারে পরবর্তী ওলামাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এবং আল্লাহই ভালো জানেন।

তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবাহ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।}" [আত-তাওবাহঃ৫] এবং "{অবশ্য তারা যদি তওবাহ করে, সালাত কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর আমি বিধানসমূহে জ্ঞানী লোকদের জন্যে সর্বস্তরে বর্ননা করে থাকি।}" [আত-তাওবাহঃ১১] এই আয়াতগুলি নির্দেশ করে যে মুশরিকদের তাওবার জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা করা এবং যাকাত আদায় করা শর্ত।

আলেমগণ প্রমাণ হিসেবে ঐ সব আয়াত ব্যবহার করেন যেগুলো নির্দেশ করে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সম্পূর্ণ ফিরে যাওয়া –তাঁর আনুগত্য সম্পূর্ণ বর্জন করা- কুফরী। "{বলুন, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুতঃ যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।}" [আল-ইমরানঃ৩২] (৪)

তাঁরা প্রমাণ হিসেবে বুখারি ও মুসলিম দ্বারা উমার ও আবু হুরাইরা (রাদিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত এ হাদিসও ব্যবহার করেন। এতে জিবরীল (আলাইহি সালাম) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলেন, "হে মুহাম্মাদ, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন"। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "ইসলাম হল এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, রমজানে রোজা রাখা এবং হজ্জ পালন করা যদি তুমি সমর্থ হও"। অন্য এক বর্ননায় জিবরীল (আলাইহি সালাম) জিজ্ঞাসা করেন, "যদি আমি সেগুলো করি তাহলে কি আমি মুসলিম?" তিনি জবাব দেন, "হ্যাঁ"। [সহীহঃ ইবনে মানদাহ থেকে বর্ণিত]

তাঁরা প্রমাণ হিসেবে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ হাদিসও উল্লেখ করেন, "আমাকে ঐসব লোকের সাথে লড়াই করতে বলা হয়েছে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত আদায় করে। যদি তারা সেগুলো করে তাহলে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার কাছ থেকে সুরক্ষিত হল, ইসলামের বিধান ব্যতীত এবং তাদের হিসাব আল্লাহর সাথে"। [আল-বুখারি ও মুসলিম]

তাঁরা প্রমাণ হিসেবে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ হাদিসও উল্লেখ করেন, "যে আমাদের সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলার সম্মুখীন হয় এবং আমাদের জবেহকৃত পশুর মাংস খায়, তখন সে আল্লাহ ও রাসূলের কাছ থেকে সুরক্ষা পেল"। [আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহ) থেকে আল-বুখারি দ্বারা বর্ণিত]

তাঁরা প্রমাণ হিসেবে সাহাবাদের এ ইজমাও পেশ করেন যে সালাত পরিত্যাগ করা রিদ্দাহ (দ্বীনত্যাগ) এবং সাহাবাদের এ ইজমাও ব্যবহার করেন যেখানে তাঁরা যাকাত দিতে অস্বীকারকারী গোত্রগুলোকে মুরতাদ হিসেবে ঘোষণা করেন। পরবর্তী ঘটনাগুলো ঐসব দলের কুফরী প্রমাণ করে যারা ক্ষমতার জোরে শরীয়াতের প্রকাশ্য ও বিখ্যাত হুকুমগুলির বিরোধিতা করে, যেমন: খামর (অ্যালকোহল) এর নিষেধাজ্ঞা, ব্যাভিচারের নিষেধাজ্ঞা এবং রিবার (সুদ) নিষেধাজ্ঞা।

আল-মারওয়াজি (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন – মৃত্যু ২৯৪ হিজরী) বলেন, "তখন আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হাদিসগুলো উল্লেখ করলাম যেখানে তার কুফরী ঘোষণা করা হয় যে সালাত ত্যাগ করে, তাকে দ্বীন থেকে বের করে দেয় এবং এটা করতে যে বাধা দেয় তাকে হত্যা করতে অনুমতি দেয়। এরকম একই বর্ননা সাহাবাদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাদের থেকে এর বিরোধী কোন কিছু আমাদের কাছে আসেনি"। [তাযিম ক্বাদর আস-সালাহ]

আল-ফুদাইল ইবনে লিয়াদ (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন – মৃত্যু ১৮৭ হিজরী) বলেন, " আল্লাহ বলেন, {তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না} [আশ-শুরাঃ১৩]। তাই দ্বীন হল বিবৃতি (ঈমানের) আমলের মাধ্যমে যা আল্লাহ বর্ননা করেছেন এবং যেভাবে তিনি তার নবী ও রাসূলদেরকে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে আদেশ দিয়েছেন। সেখানে বিভক্ত হয়ে যাওয়া হল আমলকে বর্জন করা এবং কথা ও কাজের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাওয়া। আল্লাহ বলেন, "{অবশ্য তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর আমি বিধানসমূহে জ্ঞানী লোকদের জন্যে সর্বস্তরে বর্ননা করে থাকি}" [আত-তাওবাহঃ১১]। তাই আল্লাহ শিরক থেকে তওবার ক্ষেত্রে কথা ও আমল, সালাত প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত আদায় করার মাধ্যমে উভয়কে

---

৪ আরও দেখুন সুরা আন-নূরের ৪৭ নং আয়াত, সুরা আল-ক্বিয়ামাহর ৩১-৩২ নং আয়াত, সুরা আল-লাইলের ১৫-১৬ নং আয়াত এবং সুরা আত-ত্বহার ৪৮ নং আয়াত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'কে কিছু ক্ষেত্রে অমান্য করা -যা গুনাহ- ও দ্বীনের কোন আদেশ অনুসরণ না করার মাধ্যমে তাঁকে সম্পূর্ণ অমান্য করা, উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। পরিপূর্ণ অমান্য করার শর্ত দৈনিক ৫ ওয়াক্ত সালাত পরিত্যাগের মতই, যা কুফরী।

বাধ্যতামূলক করেছেন। আহলে রায়গণ (ভুল ব্যাখ্যা) বলেন, 'সালাত ঈমান থেকে বা যাকাত বা অন্য কোন ফরয আমল থেকে আসেনি'। তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপের মাধ্যমে এবং তার কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর বিরোধিতার মাধ্যমে তা করে। যদি তারা সত্য বলত তাহলে আবু বকর মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করতেন না"। [আস-সুন্নাহ – আব্দুল্লাহ ইবনে আল-ইমাম আহমাদ]

আল-কাসিম ইবনে সালাম (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন – মৃত্যু ২২৪ হিজরী) বলেন, "যদি তারা যাকাতকে প্রতিরোধ করে স্বীকার করার পরেও, তাদের জিহবার মাধ্যমে তা বলে, সালাতকে প্রতিষ্ঠা করে শুধু যাকাত দিতে আপত্তি প্রতিরোধ করে, এই প্রতিরোধ তাদের পিছনের সবকিছু (আমল) নাকচ করে দেয় সেই সঙ্গে তাদের ঈমানের স্বীকৃতি ও সালাত, যেমন সালাতকে অস্বীকার করলে তাদের স্বীকৃতি নাকচ হয়ে যায়। এটার সাক্ষ্য বহন করে
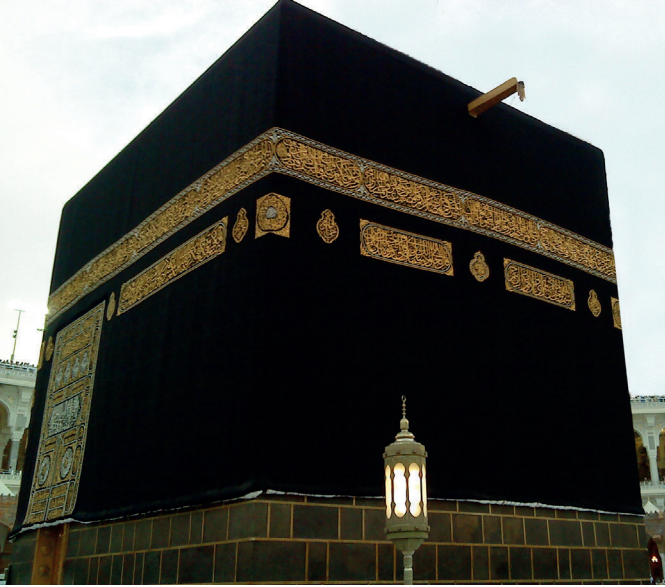
আবু বকর সিদ্দিকের (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং তার অধীনে মুহাজির ও আনসারগণের 'যাকাতের বিরুদ্ধে আরবদের প্রতিরোধের' বিরুদ্ধে জিহাদ। তার জিহাদ ছিল রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের মত, কেননা রক্ত ঝরানোর ক্ষেত্রে, পরিবারকে দাস বানানোর ক্ষেত্রে এবং সম্পদ দখলের ক্ষেত্রে এই দুই জিহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। এবং তারা অস্বীকার না করে শুধু যাকাত প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল"। [আল-ঈমান]

ইবনে আবি আসিম (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন – মৃত্যু ২৮৭ হিজরী) বলেন, "আবু বকর আস-সিদ্দিক আমার মতে রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরে সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুণান্বিত, সবচেয়ে দুনিয়াত্যাগী, সবচেয়ে সাহসী এবং সবচেয়ে উদার ছিলেন। এর প্রমাণ হিসেবে মুরতাদদের ব্যাপারে তার বিবৃতি, যখন নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাগণ তার সাথে তর্ক করলেন যাতে তিনি মুরতাদদের দ্বীন থেকে কিছু গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি আল্লাহ যা তাদের উপরে ফরয করেছেন তার থেকে কম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন বলে জানান। তিনি দেখলেন যে কিছু আয়াতের সাথে কুফরী করায় তাদের রক্তকে হালাল করে দেয়, তাই তিনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সংকল্প করলেন, এবং তিনি জানতেন যে এটাই ছিল হক্ব" [আস-সুন্নাহ]। প্রাথমিক তর্কের পরে যা ইবনে আবি আসিম উল্লেখ করেছেন, সাহাবাদের হুঁশ ফিরে আসল। উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহ) বলেন, "আল্লাহর কসম, যখনই আমি দেখলাম যে আল্লাহ জিহাদ শুরু করার ব্যাপারে আবু বকরের হৃদয় খুলে দিয়েছেন, আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি হক্কের উপরে আছেন"। [আল-বুখারী ও মুসলিম]

সুলায়মান আল আশ-শেইখ (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) বলেন, "শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, যখন তাঁকে তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যদিও তারা সাহাদাতাইনের (ইসলামের সাক্ষ্যদান) উপরে টিকে ছিল এবং ইসলামের ভিত্তির উপরে টিকেছিল বলে দাবী করত, 'প্রত্যেক দল যারা সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট আইনের বিরোধিতা করে এসব লোকের মধ্য থেকে বা অন্যদের মধ্য থেকে, তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয হয়ে যায়, যতক্ষণ না তারা এই আইনগুলো মেনে নেয়, যদিও তারা শাহাদাতাইন ঘোষণা দেয় এবং এর কিছু আইন অনুসরণ করে, ঠিক যেরকম ভাবে আবু বকর ও সাহাবাগন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তাদের পরে ফুকাহাগণ এতে সম্মত হয়েছেন'। তারপর তিনি বলেন, 'যেকোনো বিদ্রোহী দল যারা সালাত, সিয়াম বা হজ্জের যেকোনো একটি অস্বীকার করে অথবা রক্ত ঝরানো, সম্পদ অপহরণ করা, মদ, জুয়া, ব্যাভিচার এর নিষেধাজ্ঞাকে মানতে অস্বীকার করে বা কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ বা আহলে কিতাবের উপর জিযিয়া ধার্য করার বিরোধিতা করে বা দ্বীনের অন্য কোন ফরয বা নিষেধকে মানতে বিরোধিতা করে, ঐসব বিধান যাতে কেউ অজ্ঞতার অজুহাত দিতে বা ছেড়ে দিতে না পারে এবং যা অস্বীকারের মাধ্যমে কেউ কুফরী করে, তখন এ নিয়মের কারণে ঐসব বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় যদিও তারা এর মৌখিক স্বীকৃতি দেয়। এটা এরকম যাতে, আমি জানি যে, উলামাদের মধ্যে কোন দ্বিমত নাই'। তিনি বলেন, 'এরা -সবচেয়ে বিজ্ঞ আলেমদের মতে- বুগাতদের (বিদ্রোহী) মত একই স্তরের নয়। বরং তারা ইসলামে বাড়াবাড়ি করেছে ওদের স্তরে যারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে'। ... তাই যদি কোন ব্যক্তি ইসলামের প্রত্যেক আইনের উপর টিকে থাকে কিন্তু জুয়া, সুদ বা

ব্যাভিচারের[৫] নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করে, সে একজন কাফির যার বিরুদ্ধে লড়াই করা ফরয, তার ঘটনা কতইনা বড় (কুফরী) যে আল্লাহর সাথে শিরক করে, যাকে আন্তরিক ভাবে আল্লাহর কাছে দ্বীন সমর্পন করতে বলা হয় এবং বা'রা ও কুফরী ঘোষণা করতে বলা হয় এমন সবকিছুর বিরুদ্ধে যাদেরকে আল্লাহর বদলে ইবাদত করা হয় কিন্তু অহংকার বশত সে তা প্রত্যাখ্যান করে। তাই সে কাফিরদের অন্তর্গত"। [তাইসির আল-আযিয আল-হামিদ]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) আরও বলেন, "সাহাবাগণ বলেননি যে, 'তোমরা কি স্বীকার কর যে এটা ফরয, নাকি তোমরা এটাকে অস্বীকার কর'? এটা খুলাফা ও সাহাবাদের থেকে জানা যায় না। বরং, আস-সিদ্দিক উমারকে (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 'আল্লাহর কসম, যদি তারা আমাকে একটা ছোট রশি দিতেও অস্বীকৃতি জানাতো যা তারা আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিত, আমি তাদের বিরুদ্ধে এ বিরোধিতার কারণে যুদ্ধ করতাম'। তাই তিনি এটা দিতে অস্বীকার করার জন্য যুদ্ধের অনুমতি দিলেন, এর ফরযিয়াতকে অস্বীকৃতির জন্যে নয়। এরকম বলা হয়ে থাকে যে, তাদের মধ্যে একটি দল এর ফরযিয়াতকে স্বীকার করত কিন্তু কৃপণতার জন্য দিয়েছিল না, কিন্তু তা সত্বেও খালিফাহহ একই ভাবে তাদের মোকাবেলা করেছেন যেঃ তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা, তাদের পরিবারকে কৃতদাস বানানো এবং তাদের সম্পদ গণিমত হিসেবে নেওয়া এবং এটা সাক্ষ্য দেওয়া যে তাদের যোদ্ধারা জাহান্নামী। এবং (খালিফাহ) তাদের সবাইকে মুরতাদ হিসেবে চিহ্নিত করতেন"। [আল-কালিমাত আন-নাফি'আহ – আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল-অয়াহাব]

পরিশেষে, সালাত ত্যাগ করা যদি রিদ্দাহ হয় তাহলে বড় শিরকের দ্বারা (তাওহীদ) ঈমান ভঙ্গ হয়ে যাওয়া কত বড় ব্যাপার (রিদ্দাহ)! একইভাবে, শক্তির মাধ্যমে যাকাতের প্রতিরোধ যদি কুফরী হয় তাহলে 'গনতন্ত্রপন্থী পৌত্তলিক ধর্ম'কে দাওয়াহ করা এবং এর জন্য যুদ্ধ করা কত বড় কুফরী!!

মুরজিয়াদের মতে অজ্ঞতার উপকারিতা

কিছু মুরজিয়াদের মতে মৌলিক জ্ঞান ঈমানের জরুরী অংশ নয়, এমনকি যখন এ জ্ঞান খুবই প্রচলিত ও পরিচিত ।

এটা বলা হয়ে থাকে যে, মসজিদ আল-হারামে একজন ইরজায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, যদি একজন নিচের এ কথা বলে সে কি মুমিন, "আমি জানি যে কাবা সত্য এবং এটা আল্লাহর ঘর কিন্তু আমি জানিনা যে এটাই সেটা কি না [আরেকটা বর্ননায়ঃ এটি তা কিনা যা মক্কায় আছে বা খুরাসানে যা আছে তা]"। সে উত্তর দিল, "সে একজন মুমিন"। [সুফিয়ান আছ-ছাওরি বলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহর দৃষ্টিতে সে একজন কাফির, যতক্ষণ না সে জানে যে মক্কায় অবস্থিত এটাই কাবা"]। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, যদি সে নিচের কথা বলে সে কি একজন মুমিন, 'আমি জানি যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য এবং তিনি একজন রাসূল [অন্য বর্ননায়ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ একজন নবী] কিন্তু আমি জানি না যে তিনি কিনা যিনি কুরাইশ থেকে মদিনায় এসেছিলেন বা অন্য মুহাম্মাদ [অন্য বর্ননায়ঃ একজন ব্যক্তি যে খুরাসানে ছিল] [অন্য বর্ননায়ঃ আমি জানিনা যে তার কবর মদিনায় আছে কি নাই]"। সে জবাব দিল, "সে একজন মুমিন"। [সুফিয়ান আছ-ছাওরি বলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহর চোখে সে একজন কাফির"]। [আব্দুল্লাহ ইবনে আল-ইমাম আহমাদ, আল-খাল্লাল, এবং আল-লালিকাই থেকে বর্ণিত]। আল-হুমাইদি এবং ইমাম আহমাদ উভয়ে এ ঘটনার প্রেক্ষিতে মন্তব্য করেন যে, "যে এটা বলে সে কুফরী করেছে" [আল-লালিকাই]। এও বলা হয়ে থাকে যে তার উত্তরের কারণে উত্তরদানকারীকে তাওবাহ করতে বাধ্য করা হয়েছিল [আল-লালিকাই]।[৬]

অজ্ঞতার অজুহাতের (আল-ওযর বিল জাহল)[৭] ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ধারণা ঈমানের এ ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে ঈমান বাড়ে না বা কমে না এবং শুধু অন্তর ও মুখের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে অপরিবর্তনীয়(শুধু অন্তর ও মুখের মাধ্যমে স্বীকৃতি) থাকে। যারা এ বিশ্বাস রাখত তারা এ বাস্তবতার সম্মুখীন হত যে, মানুষের বিভিন্ন পরিমাণে এ ব্যাপারে সচেতনতা, জ্ঞান এবং স্বীকৃতি আছে যা নির্দেশ করে যে ঈমান বাড়ে ও কমে।[৮] তাই কিছু মুরজিয়া এ বলে জবাব দিল যে, ঈমান হল আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে অনির্দিষ্ট স্বীকৃতি

---

৫ তার কথা থেকে বোঝা যায় যে, এই নিষেধাজ্ঞাগুলোর উপর জোরপূর্বক বাধা দেওয়া বড় কুফরী। সুদ, মদ, ব্যভিচার প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ লিপ্ত থাকা গুনাহ কিন্তু কুফরী নয়।

৬ বিষয় এটা যে, ক্বাবা মক্কায়, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি মদিনায় থাকতেন (মক্কা থেকে হিজরতের পর), তাঁর কবর মদিনায়, এসব বিষয় সকল স্থানের মুসলিমরা জানে, এমনকি অনেক ইহুদী খ্রিস্টানরাও জানে। সুতরাং কোন ব্যক্তি দারুল ইসলামে উমাইয়্যা ও আব্বাসিয় খিলাফতের অধীনে থেকে, প্রসিদ্ধ ফুকাহাদের সময়ে থেকে, মসজিদে হারামের ভেতরে ক্বাবার সামনে থেকেও কি করে অজ্ঞতার দাবী করতে পারে?

৭ অজ্ঞতার কারণে অজুহাত এটা শরীয়তের পরিভাষা কিন্তু মুরজিয়াদের মত বাড়াবাড়ি পর্যায়ের নয়। ধারণাটি কখন প্রযোজ্য এটা জানার জন্য ৪৮ পৃষ্ঠায় মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের উদ্ধৃতিটি দেখুন।

৮ আহলুস সুন্নাহর মতে অন্তর, জিহবা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এর পর্যায় অনুসারে, কথা ও কাজের মাধ্যমে ঈমান বাড়তে বা কমতে পারে, শুধু আকীদার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের কারণে নয়।

–অন্তর ও মুখ দ্বারা- কোন বিস্তারিত বর্ননা ছাড়া। তাই যদি কেউ স্বীকৃতি দিত যে মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বা তাঁর দ্বীন সম্পর্কে কিছুই জানে না, তারপরেও সে মুমিন বলে মনে করা হত, যদিও এ তথ্য ছিল প্রচলিত, সুপরিচিত এবং সহজে শিক্ষণীয় ও সুলভ, এবং এমনকি যদি ঐ ব্যক্তির এই প্রয়োজনীয় এবং প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করার প্রচুর সময় ও সুযোগ ছিল!

অজ্ঞতার অজুহাতের ব্যাপারে ধারণা, যা প্রত্যেক বিষয়, প্রত্যেক পরিবেশ এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে দিকনির্দেশ করে, অজ্ঞতার প্রাথমিক ভুল ধারণার কারণে এ অজুহাত প্রদান করে এবং এভাবে তার জন্য দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জনের চেয়ে অজ্ঞ থাকা অধিক সুবিধাজনক হয়। আশ-শাফি (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) বলেন, "যদি অজ্ঞ ব্যক্তিকে তার অজ্ঞতার কারণে মাফ করে দেওয়া হত, তাহলে অজ্ঞতা জ্ঞানের চেয়ে ভালো হত, কারণ অজ্ঞতা তাকে দায়িত্বের বোঝা থেকে অব্যাহতি দিবে এবং বিভিন্ন শাস্তি থেকে তার অন্তরকে উপশম করবে। এভাবে দাসের জন্য কোন অজ্ঞতার অজুহাত নাই, যখন তার কাছে পৌঁছে যায়[প্রমাণ] এবং সামর্থ্য থাকে, {যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে} [আনি-নিসাঃ১৬৫]"। [আল-মানসুর ফিল-ক্কাওয়াইদ]

আশ-শাফি ব্যাখ্যা করেন যে একটা সাধারণ জ্ঞান প্রচলিত আছে যে, "অজ্ঞ হওয়ার কারণে কোন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে মাফ করা হবেনা, যেমন প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, মানুষের উপরে আল্লাহ রমজানে যে সিয়াম ফরয করেছেন, তাদের সম্পদের উপরে যাকাত এবং তাদের কে যে ব্যাভিচার, খুন, চুরি এবং মদ থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং একই ভাবে এটা বিবেচ্য যে, ইবাদতকারীদের বোঝা ও শেখার দায়িত্ব এবং তাদের থেকে বিতরণ এবং তাদের সম্পদ এবং আল্লাহ তাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে দায়ী থাকতে হবে। এ জ্ঞান আল্লাহর কিতাবে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় এবং মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। তাদের সাধারণ লোক এটা প্রচার করে তাদের পূর্ববর্তী সাধারণ মুসলিমদের থেকে। তারা এটা রাসুলুল্লাহ থেকে বর্ননা করে। তারা এর বর্ননায় বা এর ফরয হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। এই সাধারণ জ্ঞান ভুলভাবে বর্ননা করা বা ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া যাবেনা এবং এব্যাপারে অনৈক্য সম্ভব নয়"। [আর-রিসালাহ]

আশ-শাফির কথাগুলো ইসলামের প্রকাশ্য আইন গুলোর নির্দেশনা দেয়, তাহলে তাওহীদের ফরযিয়াত আরও কত বেশি পরিষ্কার?

আল-বারবারি (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন – মৃত্যু ৩২৯ হিজরী) বলেন, " উমার ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহ) বলেন, 'তার জন্য কোন ক্ষমা নাই যে পথ নির্দেশনা মনে করে পাপ(বক্রতা) করে অথবা বক্রতা মনে করে পথ নির্দেশনাকে ত্যাগ করে, কারণ বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে গেছে, প্রমাণ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং অজুহাত শেষ হয়ে গেছে'"। [শারহে আস-সুন্নাহ]

আলেমগণ কুরআন থেকে অনেক আয়াত উল্ল্যেখ করেন এটা প্রমাণ করার জন্য যে, কাউকে মুসলিম মনে করা হবে না যখন সে অজ্ঞতা বশত তাওহীদ ও ঈমানের ভিত্তিকে মুছে দেয় এবং ফিতরাহ ও কুরআনের বিরোধিতা করে। {একদলকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং একদলের জন্যে পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ধারণা করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে} [আল-আরাফঃ৩০]। {বলুনঃ আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত? তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করেছে। তারাই সে লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কেয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোন গুরুত্ব স্থির করব না।} [আল-কাহাফঃ১০৩-১০৫]। {আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটি এজন্যে যে এরা জ্ঞান রাখে না।} [আত-তাওবাঃ৬] । {আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা প্রত্যাবর্তন করত না, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। অর্থাৎ আল্লাহর একজন রসূল, যিনি আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা,যাতে আছে, সঠিক বিষয়বস্তু।} [আল-বাইয়িনাহঃ১-৩]। {আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। তাদের অন্তঃকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন । বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত! মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না।} [আল-বাকারাঃ৮-১৩]। {মুমিনগণ! তোমরা নবীর কন্ঠস্বরের উপর তোমাদের কন্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল,

তাঁর সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না।} [আল-হুজুরাতঃ২]। [৯]

অতএব, অজ্ঞতার কারণে কোন অজুহাত নেই মুসলিম দাবীদারদের জন্য যারা এ সাক্ষ্য দেয় যে -আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল- এর অর্থ এবং তাৎপর্য (তাওহীদ চর্চার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা এবং তাঁর প্রতি আত্মসমর্পন তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুসরণের মাধ্যমে) এর ব্যাপারে। [১০] বাকি খুঁটি গুলোর ক্ষেত্রে, একজন নতুন মুসলিম সেসবের মধ্যে কিছু ব্যাপারে অজ্ঞ থাকতে পারে, কিন্তু সাময়িক অবস্থার প্রেক্ষিতে তা ক্ষমা যোগ্য, কারণ সে জ্ঞান অর্জন করতে বাধ্য যাতে সে এই অজ্ঞতা দূর করতে পারে, কেননা ইসলাম ভঙ্গের অন্যতম কারণ হল, যে বিষয়ে আলেমগণ বলেছেন যে, "না জানার মাধ্যমে বা আমল না করার মাধ্যমে আল্লাহর(তায়ালা) দ্বীন থেকে ঘুরে যাওয়া"। প্রমাণ হল আল্লাহর এ বানী, {যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে যালেম আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব।} [আস-সাজদাহঃ২২] [নাওয়াকিদ আল-ইসলাম - ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল-ওয়াহহাব]।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল-ওয়াহহাব (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) আরও বলেন, "তুমি যা উল্লেখ করেছ...তোমার সন্দেহ এই তাগুতগুলো এবং তাদের অনুসারীর অবস্থার ব্যাপারে এবং তাদের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা, এটা তো আশ্চর্যের বিষয়! তোমার কিভাবে সন্দেহ থাকে যখন আমি এটা বার বার পরিষ্কার করে দিয়েছি? ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি যে একজন নও-মুসলিম এবং যে ব্যক্তি যাযাবর ভুমিতে লালিত পালিত হয়েছে অথবা বিষয়টি সন্দেহযুক্ত...এ ক্ষেত্রে, তাকে তাকফির করা যাবে না, যতক্ষণ না তাকে এ বিষয়ে জানানো হয়। যেহেতু, দ্বীনের মূলনীতি হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর কিতাবে পরিষ্কার ও ব্যাখ্যা করেছেন, তখন আল্লাহর দেওয়া প্রমাণ হল তাঁর কুরআন, তাই যার কাছে কুরআন পৌঁছেছে তাঁর কাছে প্রমাণও পৌঁছেছে"। [আর-রাসাইল আশ-শাখসিয়াহ]

মুরজিয়াদের মতে মুনাফিকির অস্তিত্ব নেই

কিছু মুরজিয়াদের দৃষ্টিতে মুনাফিকির কোন অস্তিত্ব নাই, বড় আকারেও নাই বা ছোট আকারেও নাই।

সুফিয়ান আছ-ছাওরি (আল্লাহ তাকে রহম করুন) বলেন, "আমাদের ও মুরজিয়াদের মধ্যে পার্থক্য তিনটা বিষয়ে। আমরা বলি ঈমান হল মৌখিক স্বীকৃতি ও আমল, অপরদিকে তারা বলে এটা আমল ছাড়াই মৌখিক স্বীকৃতি। আমরা বলি যে ঈমান বাড়ে ও কমে, অপরপক্ষে তারা বলে যে এটা বাড়ে না বা কমে না। আমরা বলি মুনাফিকির অস্তিত্ব আছে, তারা বলে মুনাফিকির কোন অস্তিত্ব নাই"। [সিফাত আন-নিফাক - আল-ফিরিয়াবি] [১১]

আল-হাসান আল-বাসরি (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন - মৃত্যু ১১০ হিজরী) কে ঐসব লোকের ব্যাপারে বলা হয়েছিল যারা বলে যে মুনাফিকির অস্তিত্ব নাই এবং যারা মুনাফিকিকে ভয় করেনা, তিনি বলেন, "আল্লাহর কসম, আমি মুনাফিকি থেকে মুক্ত এটা জানা আমার কাছে এই পৃথিবী সোনা দিয়ে ভরে দিলেও তার থেকে বেশি মূল্যবান হত"[আস-সুন্নাহ আল-খাল্লাল]। তিনি আরও বলেন, "এ রকম মুমিন কখনই ছিল না বা হবে না যে সে মুনাফিকিকে ভয় করেনা। এবং এ রকম মুনাফিক কখনই ছিল না বা হবে না যে সে মুনাফিকিকে ভয় করে। যে তার নিজের জন্য মুনাফিকিকে ভয় করে না সে একজন মুনাফিক" [সিফাত আন-নিফাক - আল-ফিরিয়াবি]।

আইয়ুব আস-সিখতিয়ানি (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন - মৃত্যু ১৩১ হিজরী) এর সামনে এক মুরজিয়া বলল, "শুধুমাত্র কুফর এবং ঈমান আছে", এটা নির্দেশ করল যে কোন মুনাফিকি নাই। আইয়ুব তাকে বললেন, "চলে যাও এবং কুরআন পড়! প্রতিটি আয়াত যা মুনাফিকি সম্পর্কে বলে, আমি ভয় করি যে তা আমার উপরে পড়ে"! [আল-ইবানাহ আল-কুবরা - ইবনে বাত্তাহ]

হুযায়ফা ইবনে আল-ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ঐসব দলের ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন যেগুলো ভবিষ্যতে আসবে। তিনি বলেন, "একটা দল বলবে, 'আমরা আল্লহতে বিশ্বাসী এবং সমান ভাবে ফেরেশতাতেও বিশ্বাসী। আমাদের মধ্যে কোন কাফির বা মুনাফিক নাই'। তাদেরকে দাজ্জালের সাথে একত্রিত করা আল্লাহর জন্য উপযোগী"। [আস-সুন্নাহ - আল-খাল্লাল]

ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহ) বলেন, "তারা বলে, 'আমাদের মধ্যে কোন কাফির বা মুনাফিক নাই'।

---

৯ আরও দেখুন সুরা আন-নামলের ৪২-৪৩ নং আয়াত ও সুরা হুদের ২৫-২৯ নং আয়াত এবং আবু জাফর আত-তাবারি (আল্লাহ তাকে রহম করুন - মৃত্যু ৩১০ হিজরী)- মুফাসসিরদের ইমাম- এর তাফসির, যার কিছু আয়াত এই পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা আছে এবং তাঁর "আত তাফসির ফি মা'লিম উসুল আদ দ্বীন" বইটি দেখুন।

১০ আরও দেখুন "দাবিক-৭" এর ২২-২৩ নং পৃষ্ঠা। ওলামারা উল্লেখ করেছেন যে জ্ঞান, আত্মসমর্পণ এবং ইখলাস -অন্যান্য বিষয়ের সাথে- এই সাক্ষ্যদানের জন্য শর্ত। এই শর্তগুলো অজ্ঞতা, আমলকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ এবং শিরক এর পরিপন্থী। সেই অনুযায়ী যে ব্যক্তি শিরক করে ও সালাত পরিত্যাগ করে সে কি করে মুসলিম হিসেবে গণ্য হতে পারে?

১১ বড় মুনাফিকির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পড়ার জন্যে "দাবিক-৭" এর ৬২-৬৬ পৃষ্ঠা দেখুন যেখানে 'কিছু অংশের' অস্বীকৃতি সম্পর্কে আলোচনা আছে এবং কুরআনে মুনাফিকদের মুনাফিকি প্রকাশ পাওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরজ হওয়ার দলিল দেওয়া আছে।

আল্লাহ তাদের পা ভেঙ্গে দিন"।[আল-ইবানাহ আল-কুবরা – ইবনে বাত্তাহ]

ইমাম আহমাদ (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) মুনাফিকির আলামত সমূহের মধ্যে মুরজিয়ারা যে বিষয়গুলোকে অস্বীকার করে তা তালিকাভুক্ত করেছেন; তারপর তিনি বলেন, "সতর্ক হও যে, মুরজিয়ারা তোমাকে তোমার দ্বীনের বিষয়গুলো থেকে পিছলিয়ে দিবে" [আস-সুন্নাহ – আল-খাল্লাল]।

মুরজিয়ারা মুনাফিকিকে দুইটা উপায়ে অস্বীকার করে। একদল -কারামিয়াহ- দাবী করে যে ঈমান হল শুধু মৌখিক স্বীকৃতি, যদিও তার অন্তরে বড় মুনাফিকি থাকে। তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সময়ের মুনাফিকদেরকে মুমিন মনে করে, যদিও তারা বিশ্বাস করে যে ঐ মুমিনরা (মুনাফিক) জাহান্নামে যাবে। অন্য দল দাবী করে যে, ঈমান বাড়ে না বা কমে না। তারা ছোট মুনাফিকিকে অস্বীকার করে বলে যে, যেহেতু এর অস্তিত্ব একজনের ঈমানকে কমিয়ে দেয়। যাহোক, মুনাফিকির অস্তিত্ব- ছোট ও বড় উভয়- কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে বর্নিত পরিষ্কার বিষয়। সুরা আল-মুনাফিকিন ও আত-তাওবা ছাড়াও এমন অনেক আয়াত ও হাদিস আছে যেগুলো এ বিষয়ে বর্ননা দেয়।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "মুনাফিকের উদাহরণ হল দুইটি ভেড়ার পালের মধ্যবর্তী

"যাও এবং কোরআন পড়!" - আইয়ুব আস সাখতিয়ানি

একটা দ্বিধাগ্রস্ত মেষ শাবকের মত। এটা একসময় এই পালের সাথে যায়, আবার অন্য সময় অন্য পালের সাথে যায় [ইবনে উমার থেকে মুসলিম বর্ননা করেন]। অন্য বর্ননায়, "সে জানেনা যে কোন পালকে অনুসরণ করতে হবে" [সহীহঃ ইবনে উমার থেকে আন-নাসাই বর্ননা করেছেন] এ হাদিস নির্দেশ করে যে মুনাফিকরা ঈমান ও কুফরের মাঝামাঝি অংশে বিচরণ করে।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেন, "নিশ্চয়, আমার উম্মাতের মুনাফিকদের অধিকাংশই এর ক্কুররাতে আছে"'[হাসানঃআব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে ইমাম আহমাদ বর্ননা করেছেন]। আল-বুখারি (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) বলেন যে, এই মুনাফিক ক্কুররার মধ্যে আছে, "তাদের ক্কুররা যারা আল্লাহর গুণাবলীকে মুছে দেয়, জাহমিয়ারা, যারা ভ্রান্ত আকাঙ্ক্ষার মানুষ, এছাড়া অন্যরাও"[খাল্ক আফ'আল আল-ইবাদ]। এই ক্কুররা শব্দটা সাহাবাদের সময় দ্বীনের উলামাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত, যেসব আলেম কুরআন মুখস্ত, তিলাওয়াত এবং বুঝার জন্যে বিখ্যাত ছিলেন, হাদিসে এসেছে যে, "ক্কুররাগণ- ছোট হোক বা বড়- উমরের শুরা পরিষদের সদস্য ছিলেন" [সহীহ আল-বুখারি]।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "আমি আমার উম্মাহর জন্য সবচেয়ে বেশি ভয় করি বাকপটু মুনাফিকদের নিয়ে"

[সহীহঃ উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহ) থেকে ইমাম আহমাদ বর্ননা করেছেন]

এই বাকপটু মুনাফিকরা বিভ্রান্তিকর আলেমদের মধ্য থেকে আসে যা উপরের হাদিসে বর্ননা করা হয়েছে। আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহ) বলেন যে যখন তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে হাঁটছিলেন, তিনি তিনবার বললেন, "এমন কিছু আছে যা আমি আমার উম্মাতের জন্য দাজ্জালের থেকেও বেশি ভয় করি"। আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহ) জিজ্ঞাসা করলেন, "কি এমন জিনিস আছে যাকে আপনি উম্মাতের জন্য দাজ্জালের থেকেও বেশি ভয় করেন"? তিনি জবাব দিলেন, "বিভ্রান্তকারী ইমামগণ"। [সহীহঃ আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহ) থেকে ইমাম আহমাদ বর্ননা করেন]।

বিদআতের অনুসারীদের মধ্যে ছোট মুনাফিকির অনেক বৈশিষ্ট্য আছে –যা একটি কবীরা গুনাহ- এছাড়াও তাদের মধ্যে অনেকেই পরিপূর্ণ মুনাফিক এবং ধর্মদ্রোহী। এটা এ কারণে যে বিদআতের গোড়া হল কুফর এবং এটা কুফরের প্রবেশ পথ। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) বলেন, "বিদায়া' কুফর থেকে উদ্গত, কারণ কোন আবিষ্কৃত মত নাই সেটা ছাড়া যেটা কুফরীর শাখাগুলোর আরও একটি শাখা উন্মুক্ত করে দেয়" [মিনহাজ আস-সুন্নাহ]। বিদআত পবিত্র ইসলাম ও ভয়ানক কুফরীর মাঝে অবস্থান করে...মুনাফিকির আরেকটা ধুসর

এলাকা।

আল-ফুদাইল ইবনে লাইয়াদ (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) বলেন, "যখন আমি সুন্নাহ অনুসারীদের থেকে কাউকে দেখি, তখন মনে হয় যেন রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীদের থেকে কাউকে দেখি এবং যখন বিদআতের অনুসারীদের মধ্য থেকে কাউকে দেখি, তখন মনে হয় যেন মুনাফিকদের মধ্য থেকে কাউকে দেখি"[শারহে আস-সুন্নাহ – আল-বারবাহারি]। তিনি আরও বলেন, "মুনাফিকির একটা লক্ষণ হল যে, কোন একজন মানুষ কোন বিদআতির সাথে হাঁটবে এবং বসবে"[আল-ইবানাহ আল-কুবরা – ইবনে আল-বাত্তাহ]। আবু কিলাবা (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন – মৃত্যু ১০৪ হিজরী) বলেন, "আমি বিদআতের অনুসারীদের জন্য মুনাফিকি ছাড়া কোন উদাহরণ খুজে পাইনি, কারণ আল্লাহ মুনাফিকিকে বর্ননা করেন পরস্পরবিরোধী কথা ও পরস্পরবিরোধী কাজ হিসেবে"। [আস-সুন্নাহ – আল-খাল্লাল]

ইবনে তাইমিয়্যাহ (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) আরও বলেন, "যখন বিদআতিরা শক্তি অর্জন করে, তখন তারা কাফিরদের মত হয়ে যায় মুমিনদেরকে হত্যা করা, হালাল বলার ক্ষেত্রে এবং তাদেরকে তাকফির করার ক্ষেত্রে, যেমন খাওয়ারেজি, রাফিদাহ, মুতাযিলাহ, জাহমিয়াহ এবং অন্যান্য শাখা যা করে। তাদের মধ্যে কিছু যুদ্ধ করে যখন তারা শক্তিশালী দলে পরিণত হয়, খাওয়ারেজি ও যায়েদীদের মত, অন্যরা তাদের বিরোধীদের হত্যা করার চেষ্টা করে ক্ষমতার মাধ্যমে বা প্রতারণার মাধ্যমে। যখন তারা দুর্বল তখন তারা মুনাফিকদের মত একইরকম। তারা মুনাফিকি ও ধোঁকা ব্যবহার করে মুনাফিকদের মতই। এটা এ কারণে যে বিদআত কুফর থেকে উদ্গত, কারণ যখন মুশরিকীন ও আহলে কিতাবরা শক্তি অর্জন করে, তারা মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং যখন তারা দুর্বল তখন তারা (মুনাফিক), তাদের (মুমিন) সাথে মুনাফিকির মত আচরণ করে"। [আল-ফাতওয়া আল-কুবরা]

অনুরুপভাবে, সাল্লাম ইবনে আবি মুতি (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন – মৃত্যু ১৭৩ হিজরী) বলেন যে, সালাফদের আলেম "আইয়ুব (আস-সিখতিয়ানি) সকল বিদআতীদেরকে খারেজী হিসেবে গণনা করতেন; তিনি বলতেন, 'খারেজীরা নামে আলাদা হয় কিন্তু তরবারীতে একই হয়'"। [আল-লালিকাই]

এবং বিদআতীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার বিধান সুপরিচিত যখন তারা অস্ত্র হাতে নেয় । চতুর্থ ন্যায়পরায়ণ খালিফাহ আলি ইবনে আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহ) এর সুন্নাহ ছিল যে তিনি খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি ইসলামের দাবীদারদের উপর রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যাদের অন্তর বিদআত ও মুনাফিকিতে রোগাগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল।

খারেজীদের প্রতিষ্ঠাতা (যুল-খুওয়াসিরাহ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলেছিল, "হে মুহাম্মাদ, ন্যায়বিচার কর"! উমার ইবনুল-খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহ) বললেন, "হে রাসূল, আমাকে এই মুনাফিককে খুন করতে দিন"। তিনি জবাব দিলেন, "আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের এ কথা থেকে যে আমি আমার সাহাবীকে হত্যা করি। এ ব্যক্তি এবং তার সাথীরা কুরআন পড়ে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী পার হয়না। তারা দ্বীন থেকে এভাবে বের হয়ে যাবে যেভাবে তীর ধনুক থেকে বের হয়"। [জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ থেকে মুসলিম বর্ননা করেছেন]। এখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহ) এর ঐ মানুষকে মুনাফিক বলার সমালোচনা করেননি, বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুনাফিকের একটা বৈশিষ্ট্য বর্ননা করে উমারকে (রাদিয়াল্লাহু আনহ) সমর্থন করেছেনঃ ধর্মীয় কাজ যার কোন বাস্তবতা নাই অন্তরে – কুরআন তিলাওয়াত যা কণ্ঠনালী পার হয়না। তখন তিনি উমারকে (রাদিয়াল্লাহু আনহ) বাঁধা দিলেন এ ভ্রান্ত দলের প্রতিষ্ঠাতা কে মারতে, এ কারণ দেখিয়ে যা তিনি বিখ্যাত মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই (ইবনে সালুল) কে হত্যা না করার সময় বলেছিলেন, যে বলেছিল, "যদি আমরা মদিনাতে ফিরে যায়, তাহলে বেশি সম্মানিতরা বেশি লাঞ্ছিতদেরকে বিতাড়িত করবে"। যখন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহ) ইবনে সালুলকে হত্যার অনুমতি চাইলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে তা করতে নিষেধ করলেন "যাতে মানুষ না বলে যে মুহাম্মাদ তাঁর সাহাবীদেরকে হত্যা করে" [জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহ) হতে বুখারি ও মুসলিম বর্ননা করেছেন]। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "তারা (খারেজী) ইসলামের মানুষদেরকে হত্যা করবে কিন্তু মূর্তিপূজারীদেরকে একাই ছেড়ে দিবে। যদি আমি ঐ সময়ে পৌঁছাই, আমি তাদেরকে হত্যা করব (যতক্ষণ না তারা বিলুপ্ত হয়ে যায়) যেভাবে আদ জাতি ধ্বংস হয়েছিল" [আবু সাইদ আল-খুদরি থেকে আল-বুখারি ও মুসলিম বর্ননা করেছেন]।

উপরের হাদিসটি দেখায় যে মুনাফিকি, বিদআত এবং তাদের সাধারণ উৎপত্তিস্থল একই। শেষের বর্ননাটি আরও দেখায় যে খারেজীদের বিরুদ্ধে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাহ কি ছিল।

তারপরেও, আধুনিক যুগের কিছু মুরজিয়ারা দ্বিধাগ্রস্ত। তারা ভাবে যে জিহাদকে পরিপূর্ণ ভাবে ছেড়ে দেওয়া মুনাফিকির একটি অকাট্য বৈশিষ্ট্য, কেননা বর্তমান যুগের মুনাফিকরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং রণক্ষেত্র প্রতিরক্ষা করে, এ কারণে তাদেরকে (মুরজিয়াদের) মুনাফিক মনে করা যাবেনা। তারা ভুলে যায় যে, যুল খুওয়াইসিরা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে সালুল উভয়ে ভয়ংকর যুদ্ধে অংশ

অংশগ্রহণ করে এবং রণক্ষেত্র প্রতিরক্ষা করে, এ কারণে তাদেরকে (মুরজিয়াদের) মুনাফিক মনে করা যাবেনা। তারা ভুলে যায় যে, যুল খুওয়াইসিরা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে সালুল উভয়ে ভয়ংকর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, খারেজীরা লড়াই করেছিল তাদের ভ্রষ্টতার জন্য এবং বেদুইন মুনাফিকরা লড়াই করেছিল মুসাইলামার পক্ষে মুরতাদদের যুদ্ধে এবং যাকাত অস্বীকারকারীদের পক্ষে। মুনাফিকরা যুদ্ধ ছেড়ে দেয় যখন তারা পরিণামে কোন পার্থিব অর্জন পায় না, যখন এটা মুনাফিকি সুবিধাকে সাহায্য করে না এবং যখন আকাংখিত পরিশ্রম তাদের জন্য অসহ্য হয়ে যায়।

হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কোন একজনের প্রার্থনা শুনলেন, "হে আল্লাহ, মুনাফিকদের ধ্বংস করে দাও"। হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন, "যদি তারা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তুমি তোমার শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারবে না" [আস-সুন্নাহ আল-খাল্লাল]।

এটা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ঐ হাদিস অনুসারে, "নিশ্চয় আল্লাহ এই দ্বীন কে উপকৃত করবেন ঐসব লোকের মাধ্যমে যাদের দ্বীনের সাথে কোন সম্পর্ক নাই [হাসানঃআবু বাকরাহ থেকে ইমাম আহমাদ বর্ননা করেছেন]। আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, " আমরা রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে একটা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজনের সম্পর্কে বললেন যে মুসলিম দাবী করে, 'এ লোক জাহান্নামের অধিবাসী'। যখন যুদ্ধ শুরু হল, লোকটি আহত না হওয়া পর্যন্ত চরমভাবে লড়াই করল। তখন বলা হল, "হে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), যে লোক কে আপনি জাহান্নামের অধিবাসী বলেছিলেন সে আজকে চরমভাবে লড়াই করেছে এবং মৃত্যু বরণ করেছে'। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "সে জাহান্নামে গেছে"। কিছু ব্যক্তি দ্বিধায় পতিত হল। যখন তাদের এ অবস্থা ছিল, তখন তাদেরকে বলা হল, "সে মারা যায়নি। সে মারাত্মক আঘাত পেয়েছিল এবং যখন রাত আসল, সে আঘাতের ব্যথা সহ্য করতে পারল না, তাই সে নিজেকে হত্যা করল"। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ বিষয়ে জানতেন এবং বললেন, 'আল্লাহু আকবর! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল'। তখন তিনি বিলালকে মানুষের মাঝে ঘোষণা দিতে বললেন যে, 'নিশ্চয়, কেউ জান্নাতে যাবে না মুসলিম আত্মা ছাড়া' এবং নিশ্চয় আল্লাহ ফাজির ব্যক্তির মাধ্যমে তার দ্বীনের উপকার করেন'" [আল-বুখারি ও মুসলিম বর্ননা করেছেন]। ফাজির হল সে ব্যক্তি যে 'ফুজুর' করে, যা মুনাফিকদের অন্যতম একটা নিদর্শন, যেভাবে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদিসে এসেছে, "যদি চারটা বৈশিষ্ট্য কারও মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে সে পরিপূর্ণ মুনাফিক, আর যদি কোন একটা বৈশিষ্ট্য থাকে তাহলে তার মধ্যে মুনাফিকির গুণ থাকবে, যতক্ষণ না সে তা বর্জন করবে। যদি সে মিথ্যা কথা বলে, আমানতের খিয়ানত করে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং তর্ক করলে ফাজার (ফুজুর) করে" [আব্দিল্লাহ ইবনে উমার হতে আল-বুখারি ও মুসলিম বর্ননা করেছেন]। ইবনে রজব (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) বলেন, "ফুজুর বলতে বোঝায় যে সে ইচ্ছাকৃত ভাবে সত্য হতে সরে যায় এমন পর্যায়ে যে, সত্য মিথ্যা হয়ে যায় এবং মিথ্যা সত্য হয়ে যায়। এটা ঐসব ঘটনা থেকে আসে যে মিথ্যা ধাবিত করে তার দিকে, যে সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক, কেননা মিথ্যা ফুজুরের দিকে ধাবিত করায় এবং ফুজুর জাহান্নামে নিয়ে যায়'" [জামি আল-উলুম অয়াল হিকাম]। আন-নববী ফাজারের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "এর মানে হল সে সত্য থেকে সরে যায় এবং ভ্রান্ত ও মিথ্যা কথা বলে" [শারহে সহীহ মুসলিম]।

উপরের বর্ননা নির্দেশ করে যে , মুনাফিকরা জিহাদে অংশ নিতে পারে, এমনকি কিছু যুদ্ধে বিজয়ী পর্যন্ত হতে পারে। শাইখুল-ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, "মুনাফিকরা, যারা বলে, '{আমরা আল্লাহ এবং শেষ দিবসে বিশ্বাস করি} [আল-বাকারাঃ৮] মুমিন নয় যারা বাহ্যিক ভাবে মুমিন। তারা মানুষের সাথে সালাত আদায় করে। তারা হজ্জ পালন করে এবং আক্রমণাত্মক যুদ্ধে অংশ নেয়। মুসলিমরা এবং মুনাফিকরা একে অপরের মধ্যে বিয়ে করে এবং একে অপরের উত্তরাধিকারী হয়'"। [মাজমু আল-ফাতওয়া]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল ওয়াহহাব বলেন, "রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সময় মুনাফিকরা জিহাদে তাদের জান ও মাল দিয়ে অংশগ্রহণ করত, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করত এবং তাঁর সাথে হজ্জ পালন করত"। [আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ]

এছাড়াও মুনাফিকদের তাবুক ও বুনিল-মুস্তালিক যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে কুরআনের অনেক আয়াত নাযিল হয় যেমন, {আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ, তারা ছিল গোনাহগার ।} [আত-তাওবাঃ৬৫-৬৬]। {যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্যে ততটুকু আছে যতটুকু সে গোনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্যে রয়েছে বিরাট

শাস্তি।} [আন-নুরঃ১১]। শেষের আয়াতটি ও সুরা নুরের অন্যান্য আয়াত ঐসব ঘটনা তুলে ধরেছে যেখানে মুনাফিকরা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর বিরুদ্ধে অপবাদ প্রচার শুরু করেছিল। এটা ঘটেছিল বনিল-মুস্তালিক যুদ্ধের প্রাক্কালে।

জিহাদের দাবীদারদের ইরজা

যদি কেউ শামের যুদ্ধক্ষেত্র নিয়ে গবেষণা করত, তবে সে দেখত যে দাওলাতুল ইসলামের আনুষ্ঠানিক বিস্তৃতির পূর্বে সামরিক দলগুলো চার ভাগে বিভক্ত ছিলঃ

১) আন্তর্জাতিক এজেন্ডা নিয়ে ইসলামী দলগুলো

২) জাতীয়তাবাদী এজেন্ডা নিয়ে “ইসলামী” দলগুলো

৩) ইসলামী এজেন্ডা নিয়ে জাতীয়তাবাদী দলগুলো

৪) গণতান্ত্রিক এজেন্ডা নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো

প্রথম দলটি নির্দেশ করে যে তারা মুহাজিরদের গ্রহণ করতে আগ্রহী এবং তাদের উপস্থিতিতে তারা ভীত ছিল না । দ্বিতীয় ভাগটি প্রত্যেক দলকে একটা ইসলামী এজেন্ডা নির্দেশ করে কিন্তু এর সাথে জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন উপাদান ও মাত্রা মিশিয়ে দেয়। তৃতীয় ভাগ প্রত্যেক দলকে জাতীয়তাবাদী এজেন্ডা প্রস্তাব করে এবং তাদের প্রজ্ঞাপনে বিভিন্ন ইসলামী ভাষা ও সংস্কৃতি অনুপ্রেরণা ও সমর্থন হিসেবে ব্যবহার করে; তারা দাবী করে যে তারা ধর্ম নিরপেক্ষ নয়।[১২] দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের মধ্যে পার্থক্য মোটামুটি বাহ্যিক, শুধু এটা বাদে যে দ্বিতীয় ভাগের নেতারা সালাফি প্রেক্ষাপট থেকে এসেছে এবং তাদের সৈনিকরা অধিক ধর্মীয় চর্চা প্রদর্শন করে। চতুর্থ ভাগটি ঐসব দলকে নির্দেশ করে যারা ফ্রী সিরিয়ান আর্মি এবং তুরস্ক ভিত্তিক সুপ্রিম মিলিটারি কাউন্সিল এর অন্তর্গত। প্রথম ভাগের বেশিরভাগ যোদ্ধাদের মধ্যে কোন সন্দেহ নাই যে চতুর্থ ভাগের সৈনিকরা মুরতাদ।[১৩] সমস্যা হল দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের জন্য যারা ইরজায় আক্রান্ত এবং যারা উভয়ে গোপন সমর্থন(অন্যান্য ভাগের কাছে সুপরিচিত) ও জনসমর্থন পেত আরব সরকারদের থেকে, পশ্চিমা বিশ্ব, তুরস্ক, সিরিয়ান ন্যাশনাল কোয়ালিশান (এসএনছি), এফএসএ, মুসলিম ব্রাদারহুড, সুরুরিয়্যাহ (মূলত মুসলিম ব্রাদারহুড এর সালাফী ভার্সন) এবং সৌদি দরবারী আলেমদের থেকে। আবার ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী দলগুলোর অনেক নেতা ব্যক্তিগত ভাবে এস এন ছি, এফ এস এ এবং মুসলিম ব্রাদারহুড এর সদস্য ছিল যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ সদস্য হওয়া অনানুষ্ঠানিক রাখা হত, তারপরেও অন্যান্যরা তা খুব ভালো ভাবে জানতো। বন্ধু হোক বা শত্রু হোক কেউই এই সম্পর্ক, সমর্থন এবং সদস্যতা অস্বীকার করতে পারত না। সর্বোপরি, এই দলগুলোর অধিকাংশই বিদআত (তাদের মধ্যে কিছু কুফরী পর্যায়ের) দ্বারা আক্রান্ত ছিল কিন্তু তাদের বিদআত কখনই তাদের আনুষ্ঠানিক আকীদা ছিল না। “ইসলামী” দলগুলো সুরুরিয়্যাহ, জামিয়্যাহ (সৌদি দরবারী সালাফী) এবং ইরজা দ্বারা আক্রান্ত ছিল। জাতীয়তাবাদী দলগুলো জাহমিয়্যাহ (চরম ইরজা এবং আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকারকারী), ইখওয়ানিয়্যাহ (মুসলিম ব্রাদারহুডের আকীদা), পীরতন্ত্র ও কুবুরিয়্যাহ (কবর পূজারী) দ্বারা আক্রান্ত ছিল।

তখন আসল মুনাফিকি... জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী দলগুলো বলতে লাগল যে, তারা তুরস্ক ভিত্তিক এন এস ছি এবং এফ এস এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত কিন্তু এস এন ছি এবং এফ এস এ এর নেতাদের থেকে সহযোগিতা নিত, তুরস্ক ভিত্তিক এস এন ছি এবং এফ এস এ এর নেতারা শামে ঐ দলগুলোর প্রধান দপ্তর পরিদর্শন করত এবং এ দলগুলোর নেতারা তুরস্কে এস এন ছি এবং এফ এস এ এর হোটেল গুলো পরিদর্শন করত। এই দলগুলোর নেতারা নিয়মিতভাবে কাতার ও সৌদি আরবে ‘আরব কূটনীতিকদের’ কাছে মেহমান হিসেবে অভ্যর্থনা পেত। তারপরে সব দলগুলো –জাওলানির দল সহ- জানত যে ইসলামী দলগুলোর আরব মুরতাদ সরকারগুলোর সাথে এবং সেই সঙ্গে কূটনীতিক, গোয়েন্দা, মিডিয়া এবং পণ্ডিতদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, যেহেতু এর অনেক কিছু ছিল প্রকাশ্য। এই ভ্রান্ত দলগুলো প্রায়ই দাবী করত যে তারা তাদের সমর্থকদের থেকে নিঃশর্ত সহযোগিতা নিত। ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী দলগুলো আরও দাবী করত যে তারা একে অপরের ভাই এবং এস এন ছি ও এফ এস এ এর সাথে তাদের রাজনৈতিক এবং সামরিক পার্থক্য ছিল। এই ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী দলগুলোর নেতারা অন্তর্নিহিত কুফরী মন্তব্য, বা তার থেকেও খারাপ, কখনও বা স্পষ্ট কুফরী মন্তব্য করত। যখন এর মোকাবেলা করা হত, তারা তাদের কথা ঘুরিয়ে দিত, তাদের পছন্দ মত অর্থে বিকৃত করত অথবা কখনও শারঈ’ যুক্তির মাধ্যমে তাদের কথা রক্ষা করত।

---

১২ তাদেরকে জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয় যাতে তাদেরকে অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ বা গণতান্ত্রিক দল থেকে আলাদা করা যায়।

১৩ সিরিয়ার জনগণের প্রকৃতিগত কারণে এসব ধর্মনিরপেক্ষ মুরতাদ দলগুলো জিহাদকে বিচ্যুত করতে খুব কম কার্যকর ছিল। তুরস্কের মুরতাদদের -এফ এস এ এবং এস এন সি-কে শামের ঘটনাগুলোতে কর্তৃত্ব অর্জন করার জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের উপর নির্ভর করতে হত। তারা তাদের ‘সম্পর্ক ও সাহায্য’ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিল। ধর্মনিরপেক্ষ মুরতাদ দলগুলো -এফ এস এ এর সামরিক পরিষদ এবং তাদের বিভিন্ন বাহিনীগুলো-মুনাফিক দলগুলোর অধিকতর “ইসলামী” এজেন্ডা ও সংস্কৃতি দাবী করার কারণে নিস্প্রভ হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, মুনাফিক দলগুলোকে ঐতিহাসিক কারণে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে তারা মুনাফিকির ধূসরতা থেকে কথা ও কাজের মাধ্যমে রিদ্দার অন্ধকারে চলে যায়, যখন তারা তাদের সাহওয়াতের মাধ্যমে কুফরীর সাথে বেরিয়ে আসার স্বাধীনতা পেল।

আল কায়দার মিত্রদের মুরতাদ পৃষ্টপোষকরা

এই বিভিন্ন দলগুলো- যদিও ক্ষমতা রাখে- কখনই তাদের দ্বারা মুক্ত জমিনে আল্লাহর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করে নি। বরং তারা শারঈ' এবং পারস্পরিক কমিটি ও আদালত প্রতিষ্ঠা করল, যারা পরিকল্পনা করল- দুই বছরের বেশি- শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য কিন্তু তারা হুদুদ কায়েম করত না, সৎ কাজের আদেশ বা অসৎ কাজের নিষেধ করত না, কারণ কমিটি দাবী করল যে তা করার উপযুক্ত সময় এখন না অথবা আদালত জীবনের কিছু নির্দিষ্ট ব্যাপারে শাসন করত (যাতে সাধারণ জনগণের অনুভূতিতে আঘাত না লাগে বা অন্যান্য দলগুলোর স্বার্থের বিরুদ্ধে না যায়)। এই কমিটি ও আদালতগুলো বিভিন্ন ভ্রান্ত পটভূমি থেকে আসা লোক দ্বারা পরিপূর্ণ, যেমন পূর্বে বর্ণিত সুরুরিয়্যাহ, জামিয়্যাহ, মুরজিয়্যাহ, জাহমিয়্যাহ, ইখওয়ান, সুফিয়্যাহ, কুবুরিয়্যাহ এবং এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ উকিল, তার থেকেও খারাপ ধর্মনিরপেক্ষ বিচারক যারা কেবল বাথিস্ট সরকার ছেড়েছে কিন্তু কখনই রিদ্দাহ থেকে তওবা করেনি! এই সবগুলোকে – এছাড়াও জিহাদ দাবীদার উলামাদেরকে- একসাথে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়েছিল...

জাতীয়তাবাদী দলগুলোর উচ্চপদে অনেক পরিমাণ সৈন্য ছিল যারা দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করত না বা রমজানে রোজা রাখত না এবং সন্ত্রাসীদের মত অভিযান চালাত মুসলিম জনগন এবং তাদের জান, মাল ও পরিবারের উপর।

তারপর সাহাওয়াত প্রতিষ্ঠিত হল এবং এই মুনাফিক ও ভ্রান্ত বিদআতীরা দাওলাতুল ইসলামের মুহাজির ও আনসারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিল। তারা এফ এস এ এর সামরিক কাউন্সিল, জামাল মারুফের সিরিয়া রেভুলিউশানারি'স ফ্রন্ট, মার্ক্সবাদী পি কে কে, মিডিয়া এবং আরব তাওয়াগিতের আলেমগণ এর পাশাপাশি থেকে এবং এদেরকে সহযোগিতা নিয়ে তা করে। এমনকি তারা প্রকাশ্য ভাবে আরব তাওয়াগিতকে তাদের সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ জানালো।

তাহলে শামের মুরজি জিহাদের দাবীদাররা কি করেছিল? তারা দাবী করেছিল যে মুনাফিক দলগুলোকে(যারা তাদের মুনাফিকির সাথে বের হয়ে গেছে এবং রিদ্দাহ করেছে) সবচেয়ে প্রবীণ ও ধার্মিক মুহাজির মুজাহিদদের মত গণ্য করতে হবে। মূলত, তারা একটি নতুন ইরজা দাবী করল যে, "আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই (ইবনে সালুল) ও আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ঈমান সমান", অনুরূপভাবে, ইবনে সালুল যদি আবু বকরের খিলাফাতে বেঁচে থাকত এবং মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুহাজির ও আনসারগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিত, তাহলে আস-সিদ্দিক তাঁর এবং ইবনে সালুলের মধ্যে বিচার করার জন্যে একটি স্বাধীন ও পারস্পরিক আদালত প্রতিষ্ঠা করতেন, যাতে এটা বোঝা যেত যে ইবনে সালুল রিদ্দাহ করেছে কিনা, যদিও বিদ্রোহের পূর্বে ইবনে সালুল তার গোটা জীবনে প্রকাশ্য এবং বড় মুনাফিকি করেছে। এর

আহমেদ জাবরা - এনএসসি এর সাবেক প্রধান

থেকেও খারাপ যে, সেই স্বাধীন ও পারস্পারিক আদালতে মুনাফিকদের থেকে বিচারক থাকত –যে বিনা সন্দেহে ইবনে সালুলকে সম্মান করত- এই শর্তে যে সে ইবনে সালুলের একই গোত্রের অন্তর্গত ছিল না। এই স্বাধীন আদালত এও ঠিক করত যে আস-সিদ্দিক ইবনে সালুলের বিরুদ্ধে কোন অন্যায় করেছেন কি না!

এছাড়াও সাহাওয়াতের পরে, মুনাফিক দলগুলোর প্রতিটি কুফরী কথা এবং কাজ – অনেক ক্ষেত্রে এর আগেও – এর একটা পছন্দ মত অর্থ করা হত, যাতে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে মুরতাদ সাহাওয়াতের দোসর বিভিন্ন জিহাদের দাবীদারদের সমর্থন করা যেত। যদি তারা বলত, "আমরা গনতন্ত্রের জন্য, একটি নাগরিক রাষ্ট্রের জন্য লড়াই করি এবং দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে আমেরিকার সাহায্য চাই। আমরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে"। তারা বলে, "সম্ভবত, তারা মনে করে যে গনতন্ত্র হল শুরা এবং একটি নাগরিক রাষ্ট্র পুলিশী রাষ্ট্রের বিপরীত। এবং সম্ভবত, তারা খারেজীদের বিরুদ্ধে, যাদেরকে কিছু আলেম তাকফির করেছে, নিঃশর্ত সমর্থন চায়। এবং সম্ভবত তারা সন্ত্রাসবাদ বলতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ বোঝায়। অবশেষে, তাদের সবাইকে অজ্ঞতার অজুহাতে ক্ষমা করা হয় এবং এটা আবশ্যক যে তাদেরকে পরিপূর্ণ মুসলিম মুজাহিদিন মনে করতে হবে যতক্ষণ না স্বাধীন/পারস্পারিক আদালত প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যে কেউ তাদেরকে তাকফির করে বা সেরকম মনে করে, সে খারেজী"! পরিশেষে, জিহাদের দাবীদাররা অজ্ঞতার অজুহাতকে কাজে লাগাত মুনাফিক দলগুলোর সমর্থনে যাদের রিদ্দাহ স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং -অনেক ক্ষেত্রে- দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর সমর্থনে মারাত্মক ভাবে ব্যবহার করত! [১৪]

জাতীয়তাবাদী এফএসএ

যদি কেউ দেখিয়ে দিত যে এই দলগুলো তাদের স্বাধীনকৃত এলাকার নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও শরীয়াহ অনুসারে শাসন করে না এবং দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে যারা শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করেছে, জিহাদের দাবীদাররা বলত যে 'শাম এখন দারুল হারব [১৫] এবং সেখানে হুদুদ কায়েম করা উচিত হবে না! অন্যরা বলত যে, যারা মুসলিমদের জীবন এবং পরিবার বিপন্ন করে তাদের বিরুদ্ধে রক্ষণাত্মক জিহাদকে তাওহীদ (শরীয়াহ) প্রতিষ্ঠার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, যেভাবেই হোক তারা মনে করে যে, এই দুই ফরয একে অপরের সাংঘর্ষিক!

যদি কেউ দেখিয়ে দিত যে, এই দলগুলোর কিছুতে এমন ইউনিট আছে যার সৈন্যরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না বা রমজানে রোজা রাখে না এবং যারা মুসলিমদেরকে হত্যা করে এবং তাদের সম্পদ চুরি করে, তাহলে তারা জবাব দিত যে বাথিস্টদের অধীনে

---

১৪ অজ্ঞতা যদি তৎকালীন মুরজিয়াদের জোরালো অজুহাত হয়ে থাকে তাহলে কে তাদেরকে দাজ্জালের জন্য অজ্ঞতার অজুহাত পেশ করা থেকে বিরত রাখবে, যখন সে (দাজ্জাল) নিজেকে নবুয়্যাত এবং প্রভুত্বের দাবী জানাবে আর শুধু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যারা তাকে তাকফির করবে?

১৫ ইবনে কুদামাহ (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) বলেন, "হুদুদ শুধু তুগুরে (সীমান্ত ফাঁড়ি) কার্যকর করা হবে। এ বিষয়ে এর ব্যতিক্রম কিছু আমাদের জানা নাই। কারণ তুগুর মুসলিম ভূমি থেকেই হয় আর এর জনগণকে সাথে সাথে অন্যদেরকেও পাপ থেকে বিরত রাখার জন্য এটা করা হয়। 'উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহ) আবু উবাদা(রাদিয়াল্লাহু আনহ) কে মদ পানকারীকে ৮০ বেত্রাঘাত মারতে লিখেছিলেন। এটা তখন বলেছিলেন যখন আবু উবাদাহ ছিলেন শামে এবং এটা তুগুর থেকে করা হয়েছিল [আল-মুগনি]। মুসলিমদের তুগুর যদি দারুল ইসলামে হয় তাহলে আর কত অঞ্চল এই তুগুর দ্বারা রক্ষা করা যায়? মুরজিয়ারা এই "দারুল হারব" পরিভাষা কে বিকৃত অর্থ করে যুদ্ধের ক্ষেত্র বোঝায়। আসলে তা যুদ্ধের অঞ্চলকে না বুঝিয়ে এমন অঞ্চলকে বুঝায় যেটা কুফফারদের দ্বারা শাসিত যেখানে মুসলিমদের সাথে সন্ধি নেই, এমনকি যেখানে কোন যুদ্ধও নেই!

পঞ্চাশ বছর শাসিত হওয়ার কারণে এই দলগুলোকে তাদের ভুলের জন্য ক্ষমা করতে হবে এবং সাধারণ শত্রু দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে এদের উপর নির্ভর করতে হবে!

তাই এই জিহাদের দাবীদাররা অজ্ঞতার অজুহাতের ধারণার ব্যাপারে এত বাড়াবাড়ি করে যে, এর মধ্যে ধর্মের ভিত্তি (শাহাদাতাইনের ভিত্তি), এর সুপরিচিত মৌলিক নীতিগুলো (প্রসিদ্ধ দণ্ডাজ্ঞা, ফরযগুলো এবং নিষেধাজ্ঞা) এবং অধিকাংশ লোকের কাছে সুস্পষ্ট বাস্তবতা (যেমন গনতন্ত্রের অর্থ, এর গঠনতন্ত্র এবং এস এন ছি ও এফ এস এ এর ধর্মনিরপেক্ষতা) ধরা পড়ে যায়। তারা ইসলামের ভিত্তিকে বর্জন করার ভয়াবহতাকে এবং সাধারণভাবে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করাকে অবজ্ঞা করে। তারা বাস্তবিক বিধানের ক্ষেত্রে মুনাফিকির ধারণাকে অস্বীকার করে। তখন এই ভয়ংকর ইরজা শামের জিহাদের দাবীদারদের (জাওলানি ফ্রন্ট) চালিকা শক্তিতে পরিণত হল, দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুরতাদ সাহাওয়াতের পক্ষে। এক্ষেত্রে বিধান সবার জানা; ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল ওয়াহহাব (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) বলেন যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা ইসলাম ভঙ্গের একটা কারণ। প্রমাণ হল আল্লাহর এ বানী, “{হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।}” [আল-মায়েদাঃ৫১] [নাওয়াকিদুল ইসলাম]। তাই এই জিহাদের দাবীদাররা ইসলামকে পাতলা কাপড়ের চেয়েও বেশি পাতলা করে ফেলেছে, যতক্ষণ না তা ইসলামকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে ফেলে এবং তাদের সাহাওয়াতের প্রকৃত প্রকাশ পায়।

দুঃখজনক ভাবে পশ্চিমা ও আরব গোয়েন্দারা শামে তাদের এ ইরজার সুবিধা নিতে সক্ষম হয় শুধু পিছনে বসে থেকে দেখতে লাগল এ জিহাদের দাবীদাররা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে এবং সাহাওয়াতের পক্ষে যুদ্ধ কর্ম। তারা জিহাদের অন্যান্য ভূমিতে তাদের এ কাজের পুনরাবৃত্তি করতে চাইল কিন্তু তারা আল্লাহর এ বানী ভুলে গেল, “{তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে।} [আত-তাওবাঃ৩২]।